Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 467 – 471
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

বিধবাবিবাহ : বিদ্যাসাগর বনাম সমকালীন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ

তপন দাস
তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : tapju14@gmail.com

Keyword
বিদ্যাসাগর, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ, বিধবাবিবাহের বিরোধিতা, আইন, বিধবাবিবাহের প্রচলন।

Abstract
সমাজে নারীর স্থান ছিল অন্তঃপুরে, শিক্ষার আলো থেকে নারীকে অনেক দূরে অবস্থান করতে হত। নারী সধবা হোক আর বিধবা হোক তাকে সমাজ নির্ধারিত আইনের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকতে হত। কিন্তু কোনও সধবা মেয়ের বয়স আট-ই হোক আর আশিই হোক তার জীবনে যদি বৈধব্যের অভিশাপ নেমে আসে, তখন সেই বিধবা নারীর সতী হয়ে ওঠার জন্য স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় তার দেহত্যাগ রক্ষণশীল সমাজ নির্ধারিত একটি বড়ো রীতি ছিল। রামমোহন রায় আইনের দ্বারা বিধবা নারীকে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে রক্ষা করলেন। স্বামীর মৃত্যুর পরে বিধবাদের সমাজে বেঁচে থাকা একটি কঠিন পরীক্ষার মতো হয়ে দেখা দেয়। অনেকে বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন, কারণ- তারা কেউই বিধবাবিবাহের প্রচলনের পক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ রক্ষণশীল সমাজের সামনে উপস্থাপন করতে পারেননই। ঠিক তখনই বিদ্যাসাগর সমাজের বিধবাদের রক্ষার জন্য তাদের বিবাহের কথা ভাবেন এবং আইন করে বিধবাবিবাহের প্রবর্তনও করেন। তিনি বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের বিশ্লেষণ করে দেখান কোথাও বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করা হয়নি। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজের প্রধান যুক্তি - বিধবাবিবাহ দেশাচার-বিরুদ্ধ; বিধবাবিবাহের প্রচলন হলে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদের ফলে বংশলোপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং পারিবারিক বিপর্যয়ও দেখা দিতে পারে। বিধবাবিবাহের ফলে হিন্দুরা যে কেবল ধর্মচ্যুত ও আচারভ্রষ্ট হবে তাই নয়, ধনেপ্রাণেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের নানান যুক্তির কাছে রক্ষণশীল মানুষের যুক্তি টিকতে পারেনি। ফলে শেষ পর্যন্ত সমাজে বিধবাবিবাহের প্রচলন হয়েছে।

Discussion

এক

সধবা নারীর বিধবা হওয়া এবং সেই বিধবার সদ্যজাত শিশুকে ত্যাগ করে মৃত স্বামীর চিতায় দেহত্যাগ করে সতী হওয়ার ধারণা রক্ষণশীন সমাজ প্রচলিত দীর্ঘদিনের সামাজিক রীতি। এই সামাজিক রীতির বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে বিধবা নারীদের বিবাহ যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে কত বড় মহৎ কর্ম বলে মনে হত তা তাঁর বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন সংস্কারকর্ম তাঁর জীবনের 'সর্বপ্রধান সৎকর্ম', এর জন্য তিনি 'সর্বস্বান্ত' হয়েছেন এবং আবশ্যক হলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নন। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন দেশাচারে যদি সমাজের অকল্যাণ হয়, তাহলে দেশাচার বলেই যে তার অন্ধদাসত্ব করতে হবে তার কোনও মানে হয় না। উনিশ শতকের শুরুতেই নানারকম সামাজিক সমস্যা এবং বিধিনিষেধ নিয়ে মানুষের মনে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। এই সব বিধিনিষেধের বন্ধন থেকে বাঙালি সমাজকে নতুন করে পথ দেখাতে, সমাজকে নতুন আলোয় আনতে অনেকেই এগিয়ে এসেছেন, এই আগ্রহ বিদ্যাসাগরের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। আর এই কারণেই আজীবন তিনি বাঙালি সমাজের বিভিন্ন সংস্কার মূলক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।

১৮৫০ - এ 'সর্বশুভকারী পত্রিকা'য় 'বাল্যবিবাহের দোষ' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশের মধ্যে দিয়ে বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারমূলক প্রয়াসের সূত্রপাত। বহুবিবাহ রদ আর বিধবাবিবাহ প্রচলনের মধ্যে দিয়েই বিদ্যাসাগরের এগিয়ে চলার প্রয়াস। তবে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাজের আবশ্যকতা বিদ্যাসাগর কি হঠাৎ একদিনে অনুভব করেছিলেন? নিশ্চয়ই না, কারণ- প্রচলিত সামাজিক প্রথা অথবা দেশাচারের গতানুগতিক ধারা পরিবর্তনের ইচ্ছা সমাজের কোনও ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর মনে অকস্মাৎ জাগে না। যখন নতুন ব্যক্তির, নতুন গোষ্ঠীর, নতুন শ্রেণির বিকাশ হয় সমাজে তখনই সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন হতে থাকে, ঐতিহাসিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ভাঙন ধরে, দেখা দেয় সমাজের নতুন ও পুরাতনের মধ্যে দ্বন্দ্ব আর এই দ্বন্দ্বের ফলে সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা অস্থির হয়ে থাকে। শ্রেণির সঙ্গে শ্রেণির বা ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তনের ফলে এবং নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠার সময়, সমাজে নতুন আদর্শ, ইচ্ছা ও সংস্কার কর্মের প্রেরণার বিকাশ হয়। ঠিক তেমনি বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রত্যক্ষভাবে এইসব সামাজিক শ্রেণি ও গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এই নতুন 'Collective Situation' থেকেই তাঁর জীবনের 'সর্বপ্রধান সৎকর্ম' বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।

দুই

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল সমাজের বহু নারীর ভাগ্যে অকালবৈধব্য। বিশেষ করে বাংলাদেশে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইসব কু-প্রথার ফলাফল ভয়াবহ রূপ হিসাবে নেমে আসে। একদিকে সমাজে বাল্যবিধবার সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকা, ওপর দিকে বাল্যবৈধব্যের সমস্যা পারিবারিক সংকট রূপে দেখা দেওয়া, আর এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ ছিল বিধবাবিবাহ। রাজা রাজবল্লভ বিধবাবিবাহের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়নি। কারণ- রক্ষণশীন পণ্ডিতেরা বিধবাবিবাহ শাস্ত্র সম্মত স্বীকার করেও ব্যবহার বিরুদ্ধ বলে সম্মতি দেননি। কিন্তু তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতার জোরে নিজের বাল্যবিধবা কন্যার জন্য বিধবাদের পুনর্বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে যথেষ্ট উপহার দিয়ে পণ্ডিতদের শাস্ত্রসম্মত অনুমোদন লাভ করেছিলেন। অথচ তাঁর সমসাময়িক আর একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চক্রান্তে তা ব্যর্থ হয় এবং দেশাচার বিরুদ্ধ বলে নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা তাঁর বিরোধিতা করে।

বাল্যবিধবাদের প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তা-বোধ অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই সমাজের বহুজনের মনে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই বাংলার সমাজসংস্কারকরা জনমনের এই প্রতিকারের ছায়াকে প্রকাশ করতে চান। কিন্তু ভারতের হিন্দুদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল - সামাজিক প্রথার প্রতি অন্ধ আনুগত্য। তাতে হস্তক্ষেপ করলে তাঁদের বিরাগ ভাজন হতে হবে এমন ধারণা মানুষের মধ্যে পালিত ছিল। তবে বিধবাদের পুনর্বিবাহ প্রথা হিন্দু সমাজের

নিম্নবর্ণের লোকের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও সাধারণত উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে এই প্রথা নিষিদ্ধ ছিল। তা সত্ত্বেও বিধবাবিবাহ নিয়ে যে বাদানুবাদ চলে তা থেকে আন্দোলন ক্রমে প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টার স্তরে পৌঁছায়। ঠিক এই সময় এমন একজন ব্যক্তির হাল ধরার প্রয়োজন ছিল, যিনি পরিচালকহীন বিশৃঙ্খল আন্দোলনের ধারাকে একটি সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে পারেন। কোনও বিশেষ ঐতিহাসিক পরিবেশে সমাজের সমষ্টি চেতনাকে এই ভাবে যারা যুগ নির্দেশিত পথে পরিচালিত করেন তাঁরাই সমাজসংস্কারক, যুগ-প্রবর্তক। বিদ্যাসাগর তেমনই একজন যুগ-প্রবর্তক ছিলেন।

আইন করে সতীদাহপ্রথা তো বন্ধ হয়েছে, কিন্তু সনাতন ধর্মের রক্ষকদের হাত থেকে জীবিত বিধবারা রক্ষা পেলেন না। রক্ষণশীল সমস্ত রোষ পড়ল জীবিত বিধবার উপর। একবার বিধবা হলে তার বয়স আটের কমই হোক বা আশির বেশিই হোক কড়া ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে, এ যেন জীবিত বিধবাদের উপর কঠিন পরীক্ষা: একাদশীর দিন তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেলেও এক ফোঁটা জল খেতে পাবে না। সারাজীবন বিধবাকে এমন বিধি মেনে চলতে হবে। ব্যাপারটা যে কত কঠিন রক্ষণশীল সমাজ বুঝতে পারেনি। বিধবাদের এই বীভৎস ব্যাপার নিয়ে গল্প লেখেন জলধর সেন 'একটু জল'। এই গল্প পড়ে পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন লিখলেন 'একাদশীতত্ত্ব', বন্ধনীতে দেওয়া ছিল 'স্মৃতি নয়, গল্প'। বিধবার দুঃখের চিত্র তাঁর কাছে সত্য ঘটনা বা 'স্মৃতি' হলেও 'গল্প' হিসেবে চালিয়ে দিতে চেয়েছেন সমাজ প্রচলিত রোষের হাত থেকে বাঁচার জন্য।

তিন

'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' পুস্তকটির প্রারম্ভে বিদ্যাসাগর বলেন যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হতে হলে সর্বাগ্রে এই বিবেচনা করা অত্যাবশক যে এদেশে বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত নেই, সুতরাং বিধবাবিবাহ দিতে হলে এক নূতন প্রথা প্রচলিত করতে হবে। এদেশের লোক যে কর্তব্য ও অকর্তব্য কর্ম শাস্ত্রবচন অনুযায়ী নির্ধারণ করেন, যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক ও বিচার-বিবেচনার সাহায্যে বিশেষ কিছু করেন না, একথা প্রথমেই বিদ্যাসাগর পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করেন। ফলে কেবল বুদ্ধি ও যুক্তির উপর নির্ভর করে বিধবাবিবাহ সংগত কি অসংগত তা প্রমাণ করার চেষ্টা করলে, তাতে যে বিশেষ কোনও ফল হবে না বিদ্যাসাগর মহাশয় বিলক্ষণ জানতেন। তাই তিনি বহু চেষ্টা করে এদেশের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের সমুদ্র মন্থন করে তাঁকে যুক্তিপূর্ণ 'বচন' বা সত্যের সন্ধান করতে হয়েছে এবং সেই সব শাস্ত্রবচনের উপকরণ দিয়ে তাঁকে নবযুগের 'মানবমুখি যুক্তিবাদে'র (Humanist Rationalism) ভিত নতুন করে গড়তে হয়েছে। এই দিক দিয়ে তিনি অনেকটা রেনেসাঁস-যুগের 'টিপিকাল হিউম্যানিস্ট' পণ্ডিতদের কর্তব্য পালন করে ছিলেন। কারণ- যাঁদের নিষ্ঠা ছিল তাঁদের পাণ্ডিত্য ছিল না এবং যাঁদের পাণ্ডিত্য ছিল, তাঁদের নিষ্ঠা ছিল না। কালোপযোগী পাণ্ডিত্য এবং সাধারণ নিষ্ঠা- এই দুয়েরই সমাবেশ বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যেমন ঘটে, ঠিক সেই রকম তাঁর সমসাময়িক আর কোনও ব্যক্তির চরিত্রে ঘটেনি, যে কারণে বিদ্যাসাগর তাঁর যুক্তিবাদী চিন্তা-চেতনায় সফল হয়েছেন।

বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেন বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম, এ বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হতে হলে আগে এটাই নিরূপণ করা আবশ্যক, যে শাস্ত্রসম্মত হলে বিধবাবিবাহ কর্তব্য কর্ম বলে প্রতিপন্ন হবে, অথবা শাস্ত্রসম্মত না হলে অকর্তব্য কর্ম বলে স্থির হবে। এখন প্রশ্ন হল শাস্ত্র কি বা কাকে বলে, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র এরূপ বিষয়ের শাস্ত্র নয়, ধর্মশাস্ত্র বলে প্রসিদ্ধ শাস্ত্রই এই ধরণের শাস্ত্র বলে গ্রাহ্য হয়। ধর্মশাস্ত্র কাকে বলে, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় তার নিরূপণ আছে। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরাঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ- এঁরাই ধর্মশাস্ত্রকর্তা। এঁদের প্রণীত ধর্মশাস্ত্রে যে সকল ধর্ম নিরূপিত হয়েছে, ভারতবর্ষীয় লোকে সেই সকল ধর্ম অবলম্বন করে চলবেন। অতএব, বিধবাবিবাহ ধর্মশাস্ত্রসম্মত হলেই কর্তব্য কর্ম বলে অঙ্গীকৃত হতে পারে; আর ধর্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ হলেই, অকর্তব্য কর্ম বলে পরিগণিত হবে। এখন আবার প্রশ্ন কোনও যুগের মানুষ কোনও ধর্ম পালন করবেন, মনুপ্রণীত ধর্মশাস্ত্রে এ বিষয়ের মীমাংসা আছে। যথা –

"অন্যে কৃতযুগে ধর্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেহপরে
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ।।"[১]

অর্থাৎ প্রত্যেক যুগের ধর্ম আলাদা আলাদা এবং যে যুগের মানুষ সেই যুগের ধর্ম পালন করে চলবে। এখন কোনও যুগের ধর্ম কি বিদ্যাসাগর তা শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত করলেন। পরাশরসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে –

"কৃতে তু মানবা ধর্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ।।"[২]

মনু-নিরূপিত ধর্ম সত্যযুগের ধর্ম, গোতম-নিরূপিত ধর্ম ত্রেতাযুগের ধর্ম, শঙ্খ-লিখিত ধর্ম দ্বাপরযুগের ধর্ম, পরাশর নিরূপিত ধর্ম কলিযুগের। সুতরাং কলিযুগের মানুষকে ভগবান পরাশর নির্মিত ধর্ম অবলম্বন করে চলতে হবে। কারণ কলিযুগের মানুষ পূর্ব পূর্ব যুগের ধর্ম পালন করে চলতে অক্ষম। পরাশরসংহিতা যে রূপে আরম্ভ হয়েছে, তা দেখলে কলিযুগের ধর্ম নিরূপণই যে পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য সে বিষয়ে সংশয়মাত্র থাকতে পারে না। উক্ত গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায় আছে —

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপাংসু নারীণাং পতিরন্য বিধীয়তে।।"[৩]

পরাশর-সংহিতার এই শ্লোকের অর্থ হল: স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মারা যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বা পতিত হয়, তাহলে এই পঞ্চ-প্রকার আপদে নারীর অন্য পতি গ্রহণ বিধেয়। পণ্ডিতদের মধ্যে এই নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়েছে। বিরোধী পক্ষের রক্ষণশীল পণ্ডিতরা বলেছেন এখানে বিবাহিত পতির কথা বলা হয়নি, ভাবি পতির কথা বলা হয়েছে এবং শ্লোকের অর্থ বাগ্‌দত্ত পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতেই হবে, তবে ঐ পতির পঞ্চ-প্রকার আপদে, ঐ কন্যা পাত্রান্তরে প্রদান বিহিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর দ্বিতীয় পুস্তকে বিরোধী পক্ষের পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা ও টীকা পর্যাপ্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ খণ্ডন করেছেন।

তিনি যে সব বিষয় শাস্ত্রানুমোদিত বলে প্রমাণ করেছেন তাঁর মধ্যে প্রধান হল –

ক. পরাশর-বচনের বিষয় বাগ্‌দত্ত সম্পর্কে নয়, বিবাহিত সম্পর্কে,
খ. পরাশরের বিবাহ-বিধি মনু-বিরুদ্ধ বা বেদবিরুদ্ধ নয়,
গ. পরাশরের বচন বিবাহ-বিধায়ক, বিবাহ নিষেধক নয়,
ঘ. বৃহৎ পরাশর-সংহিতা বিধবাবিবাহের নিষেধক নয়,
ঙ. পরাশর-সংহিতাতে পতিত ভার্যা ত্যাগ নিষেধ বা পতিত পতির প্রতি অবজ্ঞা নিষেধ নেই,
চ. বাগদানের পর বড় নিরুদ্দেশ হলে কন্যার পুনরায় দান করা নিষেধ নেয়,
ছ. পরাশরের বিবাহ-বিধি নীচজাতি বিষয়ে নয়,
জ. বিধবা কন্যাকে পিতা পুনরায় দান করতে পারেন,
ঝ. বিধবার বিবাহকালে পিতার গোত্র উল্লেখ করে দান করতে হবে,
ঞ. প্রথম বিবাহের যা মন্ত্র, দ্বিতীয় বারেরও সেই একই মন্ত্র,
ট. দেশাচার শাস্ত্র অপেক্ষা বেশি মান্য নয়।

চার

পরাশর কলিযুগের বিধবাদের পক্ষে তিনটি বিধি দিয়েছেন, বিবাহ, ব্রহ্মচর্য, সহগমন। ইতিমধ্যে আইনের মধ্যে দিয়ে সহগমনের প্রথা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন বিধবাদের জন্য দুটি পথ আছে বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য – ইচ্ছা হয় বিবাহ করবে, ইচ্ছা হয় ব্রহ্মচর্য করবে। কিন্তু কলিযুগে, ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে দেহযাত্রা নির্বাহ করা বিধবাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। এই কারণে লোকহিতৈষী ভগবান পরাশর সর্বপ্রথম বিবাহের বিধি দিয়েছেন। স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য বৃহন্নারদীয় ও

আদিপুরাণের যে বচন উদ্ধৃত করেছেন, কেউ কেউ একেই কলিযুগে বিধবাবিবাহের নিষেধ বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তা মেনে নিলেন, কিন্তু তিনি পাশাপাশি এটাও দেখালেন যে পরাশরসংহিতাতে বিধবাবিবাহের বিধি আছে, আর বৃহন্নারদীয় ও আদিপুরাণে বিধবাবিবাহের নিষেধ আছে, এর মধ্যে কোনটি শাস্ত্র বলে গণ্য হবে; অর্থাৎ পরাশরের বিধি অনুযায়ী বিধবাবিবাহ কর্তব্য কর্ম বলে পরিগণিত, আর বৃহন্নারদীয় ও আদিপুরাণের নিষেধ অনুসারে বিধবাবিবাহ অকর্তব্য কর্ম বলে স্থির করা হবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বললেন- এ বিষয়ের মীমাংসা করতে হলে, অনুসন্ধান করতে হবে শাস্ত্রকারেরা এরূপ বিরোধ স্থলে কি রূপ সিদ্ধান্ত করেছেন। ভগবান বেদব্যাস স্বীয় সংহিতাতে এ বিষয়ের মীমাংসা করেছেন –

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্ত তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা।।"[৪]

অর্থাৎ কোনও স্থানে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দেখা দিলে সেখানে বেদই প্রমাণ; আর স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হলে স্মৃতিই প্রমাণ। সুতরাং বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হলে স্মৃতি ও পুরাণ অনুসারে না চলে বেদকেই মেনে নিতে হবে; আর স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হলে, পুরাণ অনুসারে না চলে স্মৃতি অনুসারেই চলতে হবে। অতএব পরাশর স্মৃতি, বৃহন্নারদীয় ও আদিপুরাণ পুরাণ, স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ হলে পুরাণ অনুসারে না চলে স্মৃতি অনুসারেই চলতে হবে। সুতরাং বৃহন্নারদীয় ও আদিপুরাণে বিধবাবিবাহ নিষেধের কথা থাকলেও পরাশরসংহিতাতে বিধবাবিবাহের যে বিধি আছে, সেদিক থেকে বিধবাবিবাহ কর্তব্য কর্ম বলেই স্থির হচ্ছে। অতএব কলিযুগে বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রবিহিত কর্ম বিদ্যাসাগর বিশ্লেষণ করে দেখালেন। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজের প্রধান যুক্তি ছিল, বিধবাবিবাহ দেশাচার-বিরুদ্ধ; বিধবাবিবাহের প্রচলন হলে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদের ফলে বংশলোপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং পারিবারিক বিপর্যয়ও দেখা দিতে পারে। বিধবাবিবাহের ফলে হিন্দুরা যে কেবল ধর্মচ্যুত ও আচারভ্রষ্ট হবে তাই নয়, ধনেপ্রাণেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

বাল্যকালে যারা বিধবা হয়ে থাকে তারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে তা যাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে, তারাই একমাত্র অনুভব করেছে। কত শত ব্রহ্মচর্য পালন করতে অসমর্থ হয়েছে। ব্যভিচারদোষে দূষিত ও ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হয়েছিল এবং পতিকুল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত করছিল। বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করলেন যে বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত হলে, অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা, ব্যভিচারদোষ ও ভ্রূণহত্যাপাপের নিবারণ ও তিনকুলের কলঙ্ক নিরাকরণ করা যেতে পারে। তাই বিধবাবিবাহের জন্য তিনি প্রাণপণ প্রচেষ্টা করেছেন। নিন্দাকে বিদ্যাসাগর কখনই নিন্দা বলে মনে করেননি, অপমানকে অপমান বলে মনে করতেন না এবং প্রতিবাদীদের কোনও কটুবাক্যে কর্ণপাত করেননি। চতুর্দিক থেকে বর্ষিত কটূক্তির মধ্যেও তিনি 'ভূধরসম নিশ্চল' হয়ে অবিচল চিত্তে তাঁর সংকল্প কার্যে পরিণত করেছেন, কথা ও কাজের মধ্যে কোনও ব্যবধান রাখেননি। ফলে ভারতবর্ষের বিধবারা তাদের বৈধব্যযন্ত্রণার অভিশাপ থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং তিনিও তাদের কাছে ঈশ্বরতুল্য হয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১. দত্ত, তীর্থপতি, বিদ্যাসাগর রচনাবলী: প্রথমখণ্ড রাজসংস্করণ, তুলি-কলম, ১কলেজ রো, কলকাতা-৯, তৃতীয় সংস্করণ: বৈশাখ ১৪০৪, পৃ. ৬৯৬
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৭
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৯
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০৫